Department of Patents, Designs and Trade Marks

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI)

JOURNAL

February, 2023

GI Journal No.14

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- তাং-
(ক) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (অঃ ও প্রঃ)
(খ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (জিঃ আই)
(চ) সিস্টেমস্ এনালিস্ট
রেজিস্ট্রার

Published on : 13-04-23

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জি.আই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদন পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি রেজিস্ট্রার বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদন পত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলেপণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদন্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রারের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপুর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক রেজিস্ট্রার প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

রেজিস্ট্রার
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ registrar@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৩৭

আবেদনের তারিখ : ১৬-০৩-২০২১

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "বাংলাদেশের শীতলপাটি" যা শ্রেণি ২৭ তে অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে এবং ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ১৯(১) মোতাবেক জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

আবেদনকারী সংস্থা	ঃ	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
ঠিকানা	ঃ	বিসিক ভবন, ১৩৭-১৩৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম	ঃ	"বাংলাদেশের শীতল পাটি"
শ্রেণী	ঃ	২৭
ক) আবেদনকারীর নাম	ঃ	চেয়ারম্যান, বিসিক, ঢাকা।
খ) ঠিকানা	ঃ	বিসিক ভবন, ১৩৭-১৩৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গ) ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকাঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

ঘ) প্রকারঃ ডিজাইন, আকার, উপাদান, উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রভৃতির ভিত্তিতে শীতল পাটি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, তবে প্রাথমিকভাবে শীতল পাটি ৪ (চার) প্রকার, যথা-

(ক) সাধারণ পাটি ;
(খ) সিদ্ধ পাটি ;
(গ) নকশী পাটি ;
(ঘ) সিদ্ধহীন পাটি।

আবার শীতল পাটির নকশার ধরনের উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু শ্রেণীবিন্যাস করা হয়ে থাকে। যেমন-

(ক) তাজমহল ;
(খ) গাছপদ্ম ;
(গ) নামাজি পাটি ;
(ঘ) আদি ;
(ঙ) কমলকুশ ইত্যাদি।

চ) শীতল পাটির স্পেসিফিকেশন ঃ

০১। শীতল পাটি সম্পূর্ণ হাতে তৈরী করা হয়।

০২। শীতল পাটি এক ধরনের মেঝেতে পাতা মসৃণ আসন।

০৩। প্রকৃতিতে উৎপাদিত মুর্তা বা পাটি বেতি বা মোস্তাক (বৈজ্ঞানিক নাম : Schumannianthus dichotomus) নামক গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের ছাল থেকে এগুলো তৈরি হয়ে থাকে।

০৪। পাটি গাছের কান্ড দেখতে নলের মতো, এই কান্ড থেকে বেতি তুলে শীতল পাটি বোনা হয়।

০৫। পাটি গাছের বাকলের ওপরের অংশ দিয়ে দামি পাটি তৈরী হয়। রঙ লাগিয়ে কখনো বা রঙ ছাড়াও শীতল পাটি বোনা হয়।

০৬। কোন প্রকার জোড়া ছাড়াই যে কোন মাপের শীতল পাটি তৈরী করা যায়।

০৭। শীতল পাটির উৎপাদন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারী কোন মেশিনারীজ বা যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয় না ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।

০৮। একই শীতল পাটি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায় যেমন শোপিস, জায়নামাজ ও মাদুর হিসেবে। তবে বর্তমানে এই বেতি দিয়ে মানিব্যাগ, আয়নার ফ্রেম, ভ্যানিটি ব্যাগ, টেবিল ল্যাম্প, ওয়ালমেট, পাদুকা, ফুলদানি, কলমদানি, ছবির ফ্রেম, কুশন, খেলনা, ফাইল ফোল্ডার ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরী হচ্ছে।

০৯। এই পাটিগুলোতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিসহ বিভিন্ন ধরনের নকশা, পশু-পাখির অবয়ব ফুটিয়ে তোলা যায়। তাই এগুলোকে নকশী পাটিও বলা হয়।

১০। শীতল পাটির বিশেষত্ব হলো এর আরামদায়ক শীতল অনুভূতি।

১১। রঙিন নকশাকার পাটি তৈরীর জন্য পানি ও ভাতের মাড়ের সংগে রঙের গুড়া মেশানো হয়।

১২। এই পাটিকে মোলায়েম মসৃণ করতে বেতিকে পানির সঙ্গে ভাতের মাড় এবং আমড়া, জারুল ও গেওয়া ইত্যাদি গাছের পাতা মিশিয়ে সিদ্ধ করা হয়।

১৩। সাধারণত একটি পাটি সাত ফুট বা পাঁচ ফুট হয়ে থাকে। একটি শীতলপাটি তৈরী করতে পনের থেকে বিশ দিন, এমন কি পাঁচ থেকে ছ'মাস সময় লাগতে পারে। একটি শীতলপাটির দাম পাঁচশ' টাকা থেকে শুরু করে ছ'হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। তবে ফরমায়েশ দিয়ে পছন্দমতো পাটি তৈরী করাতে খরচ আরো বেশী হয়।

১৪। শীতল পাটির বৈশ্বিক গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০১৭ সালে শীতল পাটিকে ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

(চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনাঃ

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনার পূর্বে এর ঐতিহ্যিক ও সাংস্কৃতিক দিকটি আলোকপাত করা প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ। অঞ্চলভেদে এর যেমন রয়েছে বিচিত্রতা, তেমনি রয়েছে ভিন্নতা। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর কারুশিল্পগুলোর মধ্যে শীতল পাটি অন্যতম।

শীতল পাটি শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা হিম হিম আবহ খেলা করে মনোভূমিতে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত কুটির শিল্প শীতল পাটি মূলত মেঝেতে পাতা এক ধরনের সুসজ্জিত আসন। সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বজুড়ে বাঙালির সৌখিনতার সুনাম রয়েছে, শীতল পাটি তেমনি এক সৌখিনতার প্রতীক। আগের দিনে যখন বিদ্যুৎ ছিল না, তখন কাঁথা বা তোশকের ওপর মিহি বেতের নকশি করা এক ধরনের পাটি ব্যবহার হতো, তাতে শরীরটা এলিয়ে দিলে শরীর বা মনে শীতল পরশ অনুভূত হতো। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছিল শীতল পাটি। শীতল পরশের পাশাপাশি বর্ণিল নকশা সবাইকে মুগ্ধ করে। শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় ফুটে উঠে বর্ণিল ফুল, ফল, পশু-পাখি, প্রিয়জনের অবয়ব এমনকি জ্যামিতিক গাণিতিক নকশাও। শীতল পাটির নকশায় জায়নামাজে ব্যবহৃত হয়েছে মসজিদসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। এ শীতল পাটিকে ঘিরে যুগে যুগে কত গান, কত কাব্য রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

"চন্দনেরি গন্ধভরা,
শীতল করা, ক্লান্তি-হরা
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখানটিতেই শীতল পাটি"।

'খাটি সোনা' কবিতায় বাংলার মাটিকে অনেকটা এভাবেই শীতল পাটির সাথে তুলনা দিয়েছিলেন 'ছন্দের জাদুকর' খ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সেই আদিকাল থেকেই শীতল পাটির কদর সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে ছিল। অনেকটা ঢাকাই মসলিনের মতো বাংলাদেশের শীতলপাটির কারুকার্যেও মুগ্ধ ছিলো সারা বিশ্ব। সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার তেঘরিয়া গ্রামের শীতলপাটি জায়গা করে নিয়েছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজসভায়। মুঘল রাজদরবারেও বেশ কদর ছিলো শীতল পাটির। মৌলভীবাজার জেলার দাসের বাজারের রুপালি বেতের বাহারী কারুকাজ করা শীতল পাটি মুর্শিদকুলি খাঁ মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে উপহার দিয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিলেটে আমন্ত্রিত হয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন বেতের উপর কারুকার্যশোভিত এই শীতল পাটি দেখে শান্তিনিকেতনে ব্যবহারের জন্য বেশ কয়েকটি কলকাতায়ও নিয়ে গিয়েছিলেন। ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ 'ইউনেস্কো' শীতলপাটির বুনন শিল্পকে 'Intangible Cultural Heritage' এর তালিকায় স্থান দিয়েছে।

শীতল পাটির কাঁচামাল হচ্ছে 'মুর্তা' নামের এক ধরনের গাছ। এগুলো বনময় জলাভূমিতে আগাছা হিসেবে জন্মে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'মুর্তা' গাছ জন্মে। মুর্তা গাছটি প্রায় ৫ থেকে ৮ ফুট উঁচু হয়। গাছটি এক দেড় ইঞ্চি ব্যাসের পাইপের মতো। গাছ কাটার পর গাছের ছাল সংগ্রহ করতে হয়। গাছের এই ছালই হচ্ছে শীতল পাটি তেরীর উপকরণ। এই ছাল দিয়ে বানানো হয় শীতলপাটি। ছালটা গাছের সাথে জড়ানো অবস্থায় গাঢ় সবুজ রঙের থাকে। গাছ থেকে ছালটা আলাদা করার পর তার রঙ হয় রূপালী। বেতিশিল্পীরা কখনো কখনো রূপালী বেতিকে নানা রঙে রাঙিয়ে নেন।

কোন ধরনের যন্ত্র ছাড়া খালি হাতেই এই পাটি বানানো হয়। সাধারণত একটি পাটি সাত ফুট বা পাঁচ ফুট হয়ে থাকে। একটি শীতলপাটি বানাতে পনের থেকে বিশ দিন, এমন কি পাঁচ থেকে ছ'মাস সময় লাগে। একটি শীতলপাটির দাম পাঁচশ' টাকা থেকে শুরু করে ছ'হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। তবে ফরমায়েশ দিয়ে পছন্দমতো পাটি তৈরী করাতে খরচ আরো বেশী হয়। প্রচলিত রয়েছে শীতলপাটির শিল্পীরা এতো উন্নত মানের শীতল পাটি বানাতে পারেন, সেই পাটির উপর একটি সাপ ছেড়ে দিলে সেই সাপ শীতল পাটির উপর দিয়ে চলাচল করতে পারে না।

শীতল পাটি নামের মধ্যেই রয়েছে এর গুণ। এই পাটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গরমে ঠান্ডা অনুভূতি হয়। শীতলতার পাশাপাশি নানান নকশা, রং ও বুননকৌশল মুগ্ধ করে সবাইকে। প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি হওয়ার কারণে স্বাস্থ্যসম্মত এই পাটি। শীতল পাটি নিপুণ হাতের বুননে মুর্তা নামে একধরণের ঝোপজাতীয় গাছের বেতি দিয়ে তৈরি হয়। গ্রীষ্মকালে শীতল পরশের জন্য বেড়ে যায় শীতল পাটির কদর। পাটির সঙ্গে 'শীতল' নামকরণের মাহাত্ম্য এখানেই। এটি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী একটি শিল্প। বিশেষ করে শুকনা মৌসুমে মুর্তা থেকে বেতি তৈরী করা হয় এবং বর্ষা মৌসুমে দীর্ঘ সময় নিয়ে যত্ন সহকারে বোনা হয় শীতল পাটি। শীতল পাটিতে কারিগররা দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তোলেন জীবজন্তুসহ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি। পল্লীকবি জসীম উদ্দীন তাঁর 'নকশি কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থে 'কামরাঙা' নামক রচনায় শীতল পাটির প্রাণবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। কবির বর্ণনা থেকে শীতল পাটির শৈল্পীক বর্ণনা চিত্রায়িত হয়েছে।

"আসুক আসুক বেটির দামান কিছু চিন্তা নাইরে,
আমার দরজায় বিছাইয়া থুইছি কামরাঙা পাটি মারে"

(ছ) শীতল পাটি উৎপাদনের এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় শীতল পাটি তৈরি করা হয়। আদি উৎস হিসেবে সিলেট জেলার বালাগঞ্জ শীতল পাটির জন্য প্রসিদ্ধ। সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলার তেঘরিয়া, চাঁনপুরম, শ্রীনাথপুর, আতাসন, লোহামোড়া, খুজগীপুর, কোয়ারগাঁও, হরিশ্যাম, টেকামুদ্রা, কমলপুর, গৌরীনাথপুর, কাশীপুর, প্রসন্নপুর, তুলাপুর, গোরাপুর, চাঁদপুর, করছারপাড়, বালাগঞ্জ সদর, বাবরাকপুর, রাধাকুনা, ধুলিজুরা, মজলিশপুর, আদিত্যপুর, বারকুড়ি, হাশামপুর, আব্দুল্লাপুর, খুদ লতিপুর, মহাম্মদপুর, নুরপুর, ধওপাওন, মুসলিমবাদ, পূর্ব আসাতন, আলগাপুরসহ আরও বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েকশ পরিবার শীতল পাটি শিল্পের সঙ্গে জড়িত। এ অঞ্চলের অন্যান্য স্থানেও শীতল পাটি তৈরি করা হয়ে থাকে। কিন্তু বালাগঞ্জের শীতল পাটিই অনন্য। এক সময় এ উপজেলায় তৈরি শীতল পাটি শুধু বাংলাদেশেই বাজারজাত হতো না, তা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানেও রপ্তানি হতো। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ায় শীতল পাটির কদর ছিল ঈর্ষণীয়। ভারতবর্ষে আগমনের প্রমাণ হিসাবে ভিনদেশিরা স্মৃতি হিসেবে ঢাকাই মসলিনের পাশাপাশি বালাগঞ্জের শীতল পাটি নিয়ে যেতেন।

বৃহত্তর সিলেটের চার জেলার সব ঘরে শীতল পাটি তৈরি হয় না বটে, তবে এর কদর ঘরে ঘরে। সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার কাশীপুর গ্রাম পাটির জন্য বিখ্যাত বলে পরিচিতি পেয়েছে 'পাটিপল্লী' বলে। গ্রামের পাশ দিয়েই এঁকেবেঁকে চলে গেছে একটা খাল এবং সেখানেই শীতলপাটি বুননের কর্মযজ্ঞ। শীতল পাটি সিলেটের ঐতিহ্যবাহী একটি শিল্প। সিলেটের বালাগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলা মূলত এ শিল্পের আদি স্থান। এর বাইরে সিলেটের গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ছাড়াও সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ, জগন্নাথপুর; হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং মৌলভীবাজারের বড়লেখা, রাজনগরসহ সিলেট বিভাগের চার জেলার দুই শতাধিক গ্রামে শীতলপাটি বুননের সঙ্গে সহস্রাধিক পরিবার যুক্ত রয়েছে। যুগ যুগ ধরেই বংশপরম্পরায় এসব গ্রামের নারী-পুরুষেরা এই কাজ করে আসছেন।

এ ছাড়া বরিশাল বিভাগের বরিশাল, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলায় প্রচুর শীতল পাটি উৎপাদন হয়। যেমন, বরিশালের বাকেরগঞ্জের রংগশ্রী ইউনিয়নের কাঠালিয়া গ্রামে স্বল্প পরিসরে শীতল পাটি উৎপাদন করা হয়। এ এলাকার নারী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ১৫০ জন শীতল পাটি উৎপাদনের সাথে জড়িত। ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার হাইলাকাঠি, ডহসংকর, সাংগর, জগন্নাথপুর গ্রামের প্রায় ২০০ টি পরিবার শীতল পাটি তৈরি করে ও পাটি তৈরির প্রধান কাঁচামাল মুর্তা (বরিশালের স্থানীয় ভাষায় পাইত্র্যা নামে পরিচিত) নামক এক প্রকার গুল্ম জাতীয় গাছ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া রাজাপুর সদর, নলছিটির তিমিরকাঠি, কামদেবপুর প্রভৃতি জায়গায় শীতল পাটি তৈরি হয়।

ঝালকাটির সদর উপজেলার কাসারীপট্টি, বাঁশপট্টি ও ডাক্তারপট্টি এলাকায় প্রায় ৯০ জন এ শিল্পের সাথে জড়িত। জেলার হাইলাকাঠি এলাকার পাটিকররা সবচেয়ে ব্যস্ত সময় কাটায় শীতল কাঠি বুননের পিছনে। এই গ্রামে প্রায় ১০০ বিঘা জমিতে শীতল পাটির কাঁচামাল পাইত্র্যা চাষ হয়। এখানে প্রায় ২০০ জন কৃষক এ পাইত্র্যা চাষাবাদ ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এছাড়া শুক্তাগড় ইউনিয়নের সাংগর ও জগন্নাথপুর গ্রামে আনুমানিক ২০ একর জমিতে পাইত্র্যা জন্মে। তবে সব পাইত্র্যা চাষিরা এখন আর পাটি বোনে না, অনেকে বিক্রি করে দেয়। পিরোজপুর জেলার কাউখালি উপজেলার চিড়াপাড়া, পাটিপাড়া ও সুবিদপুর গ্রামে প্রায় ২২০ জন শীতল পাটি শিল্পের সাথে জড়িত। এখানে অন্য জায়গা থেকে কাঁচামাল ক্রয় করে এনে পাটি তৈরির কাজ করা হয়।

বৃহত্তর ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল, মুন্সীগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলায় শীতল পাটির উৎপাদন কার্য পরিচালিত হয়। টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ারের আটিয়া ও হিংগানগরে প্রায় ১২০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাটি শিল্পের সাথে যুক্ত আছে। তাছাড়া, কালীহাতী উপজেলার সিলিমপুর (চাটিপাড়া) তে ৫০০ এর অধিক পরিবার শীতল পাটি বুননের কাজ করে থাকে। মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বাংলাবাজার, নমকান্দি, টংগীবাড়ীর আব্দুল্লাহপুর ও পাইকপাড়া, সিরাজদিখানের ইছাপুরা, রাজদিয়া, জৈনসার ও ভাটিরবুক এলাকার প্রায় ৪০০ জন পাটি শিল্পের কারিগর আছে। নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার তেতুলিয়া ও জৈনপুর, খালিইয়াজুরি উপজেলার বরান্তরে প্রায় ৩০০ এর অধিক পরিবার শীতল পাটি শিল্পের সাথে জড়িত।

চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, কক্সবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় শীতল পাটি উৎপাদিত হয়। চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার ২ নং হিংগুলী ইউনিয়নের ইসলামপুর, মামদপুর, পশ্চিম হিংগুলী এবং ১০ নং মিঠানালা ইউনিয়নের সুফিয়াবাজার, সৈয়দপুর, ভোরবাজার, পশ্চিম মিঠানালা এলাকায় প্রায় ১৮০ জন পাটিকর এ শিল্পের সাথে জড়িত। লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর আলগী, চর টবগী, চর আলগী, চর নেয়ামত, চর সেকান্তর, চর মেহায়, চর গোসাই, চর রমিজ, চর আবজল, বড়খিরি, চরগাজী ও দক্ষিণ আবজল এলাকায় ১০০০ এর বেশি মানুষ শীতল পাটি তৈরির কাজ করে থাকে। ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার মঙ্গলকান্দি, বালিগাও, নবাবপুর এবং সদর উপজেলার সুন্দরপুর, নেয়ামতপুর, চাদপুর, কালিদহ, ফাজিলপুর, ধলিয়া, দোলতপুর, আলিপুর, ধলিয়া, মাছিমপুর, উঃধলিয়া, অনন্তপুর এলাকায় প্রায় ২০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এ শিল্পের সাথে জড়িত। তাছাড়া, চাঁদপুর জেলার কচুয়ার কড়াইয়া, শাহরাস্তির নোয়াগাঁও এবং চাঁদপুরের কল্যাণপুর ও সফরমালী এলাকার প্রায় ১০০ পরিবার এ শিল্পের সাথে জড়িত। কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়ার দক্ষিণ ধুরুং-এর নাথপাড়ায় কয়েকটি পরিবার এ শিল্পের সাথে জড়িত। তাছাড়া, ব্রাহ্মনবাড়িয়ার কিছু অঞ্চলে এ পাটি শিল্পের দেখা মেলে।

রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী, নওগাঁ এবং সিরাজগঞ্জে শীতল পাটির উৎপাদন হয়ে থাকে। রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলার বাসুপাড়া ও সাইপাড়া এলাকায় কয়েকজন শীতল পাটি কারিগর রয়েছে। নওগাঁ জেলার নওগাঁ সদরের চন্ডিপুরের বিলভট্টিপারা, তেপারা, কিসমতপুর এবং রাণীনগরের কাশিমপুর এলাকায় শীতল পাটি উৎপাদিত হয়। তাছাড়া, সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদরের কালিয়া, হরিপুর, চুনিয়াহাট, কামারখন্দের ঝাঐল, চাঁদপুর এবং রায়গঞ্জের ধানগড়া, দরবস্ত, আটঘটিয়া এলাকায় ৬০০ এর অধিক পরিবারে শীতল পাটি উৎপাদিত হয়।

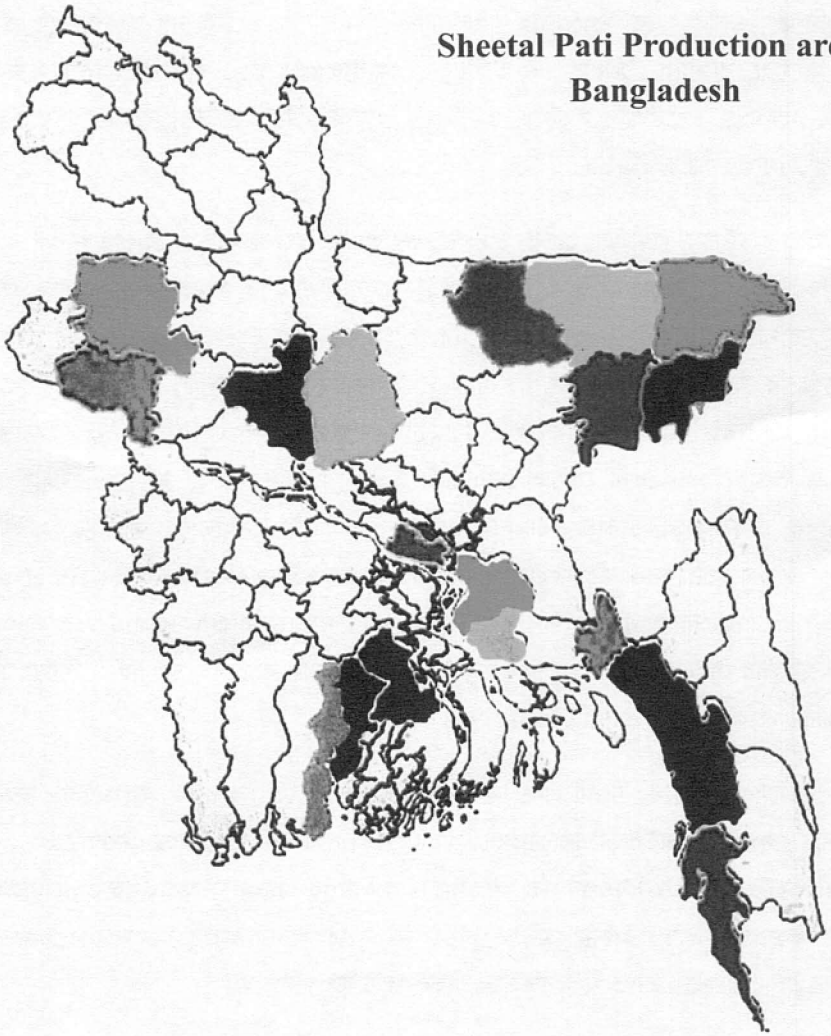

বাংলাদেশের এসব অঞ্চলে এই শিল্প গড়ে উঠার মূল কারণ শীতলপাটি তৈরির উপকরণ মুর্তা বেতের সহজলভ্যতা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া মুর্তা গাছের জন্য সহায়ক হওয়ায় প্রচুরমুর্তা গাছ জন্মে এসব অঞ্চলে। এই গাছ থেকে আহরিত বেত দিয়েই তৈরি করা হয় শীতল পাটি। পরিকল্পিতভাবে বরিশালের ঝালকাঠি জেলায় মুর্তা বেতের চাষাবাদ করা হলেও বিশেষ ধরণের এই গাছ বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের স্যাঁতস্যাঁতে মাটি ও বাড়ির পাশ্ববর্তী ভেজা নিচু জমিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে। আঞ্চলিকভাবে সহজলভ্যতাই এ শিল্পের সৃষ্টি করেছে।

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল) ঃ

(১) শীতল পাটির ঐতিহাসিক দলিল ঃ

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের বেতি শিল্পকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ শিল্পীদের কারুকার্য খচিত শীতল পাটি বিশ্বজুড়ে গৌরবের শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে বাংলাদেশকে। শীতল পাটির পুরোনো ঐতিহ্যকে আজও ধারণ করে চলছে বাংলাদেশের বেশকিছু অঞ্চলের পাটিকররা। স্থানীয় ভাষায় এই গোষ্ঠীকে পাটিয়ারা নামে অভিহিত করা হয়। শীতল পাটির কাহিনী অনেক দীর্ঘ। ব্রিটিশ আমল থেকেই এর কদর। ব্রিটিশ রাজপ্রাসাদে শীতল পাটি শোভা পেয়েছে।

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি (১৮৬৫-১৯৫৩) ছিলেন বৃহত্তর সিলেটের একজন ইতিহাসবিদ ও বৈষ্ণব সাহিত্যের সুখ্যাত পন্ডিত, যিনি বিশেষত সিলেটের বিস্তৃত ইতিহাস রচনার মাধ্যমে সমাদৃত হন। ১৯২০ দশকে প্রকাশিত তাঁর ১,৬৬৩ পৃষ্ঠার "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" নামক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থটি শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ) ও শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (উত্তরাংশ) নামে দুইটি আলাদা আলাদা খন্ডে প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে তিনি শীতল পাটির উৎসগত বিবরণ তুলে ধরেন। যতটুকু জানা যায়, "রানী চন্দ্রপ্রভা বা তারও আগে থেকে এই এলাকায় শীতল পাটির জনপ্রিয়তা বিরাজ করে আসছে। অবিভক্ত সুরমা উপত্যকার ইতিহাসে এই পাটিশিল্পের বহু মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহ্য রয়েছে। সুফী সাধক শীতালং শাহ শীতল পাটিতে বসেই ধ্যানমগ্ন থাকতেন" এমন কথাও শোনা যায়। এছাড়াও হিউয়েন সাং এর ভারতবর্ষ আগমনের সময়ে সুরমা-বরাক উপত্যকায় শীতল পাটির ব্যবহার ছিল এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। "৬৪০ সালে হিউয়েন সাং সিলেট ভ্রমণ করেন। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার আমন্ত্রণে তিনি প্রাচীন শিলাচটোল (বর্তমান সিলেট) জনপদে সমতট থেকে জলপথে এসে পৌঁছেছিলেন। হিউয়েন সাং এর বর্ণনায় এক ধরণের আসনই যে শীতল পাটি তা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে এতদঞ্চলে শীতলপাটির কারিগর ছিলেন এমন অনুমান অমুলক নয়।

শীতলপাটি ভারতসম্রাজ্ঞী মহারানী ভিক্টোরিয়ার ব্রিটিশ রাজপ্রাসাদেও স্থান পেয়েছিল। ভারতবর্ষে আগমনের প্রমাণ ও স্মৃতিস্মারক হিসেবে ভিনদেশিরা ঢাকার মসলিনের পাশাপাশি সিলেটের বালাগঞ্জের শীতলপাটি নিয়ে যেতেন। কথিত আছে, মৌলভীবাজার জেলার দাসের বাজারের রূপালি বেতের শীতলপাটি মুর্শিদ কুলি খাঁ সম্রাট আওরঙ্গজেবকে উপহার দিয়েছিলেন। সিলেট অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী এই 'শীতলপাটি'-কে কেউ কেউ নকশিপাটিও বলে থাকেন। ময়মনসিংহ গীতিকা ও লোকসাহিত্যেও নানাভাবে উঠে এসেছে শীতলপাটির কথা।

শীতল পাটির একটা ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক ভিত্তি হচ্ছে আভিজাত্য। শীতল পাটির ইতিহাসের কথা বলতে গেলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্মাননার কথা চলে আসে, যেমন, ১৯০৬ সালে কলকাতায় কারু শিল্প প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের যদুরাম দাস শীতল পাটির জন্য প্রথমবারের মতো স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৮২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শীতল পাটির জন্য শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী হিসেবে পুরস্কৃত হন বালাগঞ্জের পবঞ্জয় দাস।

পুরোনো যুগ হতে শীতল পাটির ব্যবহার ছিল ব্যাপক। কোন বিয়ের অনুষ্ঠানে কনে সাজানোর আনুষঙ্গিকের সঙ্গে বর পক্ষকে একটা পাটিও দিতে হতো। এই পাটিতে কনেকে বসিয়ে সাজানোর রেওয়াজ ছিল। আবার কনে পক্ষ যখন বরের বাড়িতে আসবাবপত্র পাঠাত, সঙ্গে একটা শীতল পাটিও দেওয়া হতো। ১৯২০ সালে প্রকাশিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' নামক গ্রন্থে শীতল পাটি সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে বলা হয়; অন্যান্য শিল্পের মধ্যে শীতল পাটি একটি বিখ্যাত শিল্প। "মুর্তা নামক এক প্রকার উদ্ভিদ থেকে বেত্র দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা শীতল মসৃণ ও আরামদায়ক বলিয়া সর্বত্র আদৃত।

বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বের কোথাও উৎকৃষ্ট পাটি প্রস্তুত হইতে পারে না"। প্রাচীন মোঘল আমল থেকে এদেশের পাটি আদৃত ছিল। পাটির গুণগত মান অনুযায়ী মূল্য নির্ধারিত হতো। ১০ আনা থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত মূল্যে বিক্রি করা হতো। কখনও কখনও শীতল পাটি এক'শ- দু'শ টাকায় বিক্রি হতো বলে জানা যায়। কোথাও ২০-২৫ হাত লম্বা পাটি তৈরি হতো বলে জানা যায়। ১৮৭৬-৭৭ সালে সিলেট থেকে ৩ হাজার ৯২৭ টাকা মুল্যের পাটি বিদেশে রপ্তানি হয়েছিল বলে জানা যায়। পরবর্তীতে শীতল পাটি লন্ডনপ্রবাসী সিলেটিদের আনুকূল্যে বিলাস দ্রব্যসামগ্রী রূপে রপ্তানি পণ্য হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হয় এবং বর্তমানে বাংলাদেশের বিভন্ন অঞ্চলের শীতল পাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শোভা পাচ্ছে। ('শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত')

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিলেট এসেছিলেন। সিলেট সফরকালে সিলেটের বেত ও বাঁশের বানানো চেয়ার, টেবিল, ব্যাগ ইত্যাদি দেখে অভিভূত হয়ে কয়েক ফর্দ কিনে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ব্যবহার করেছেন। বাঁশ বেত সামগ্রীর মধ্যে শীতলপাটিই সবচেয়ে বিখ্যাত যেটা একসময় মুঘল বাদশাহদের মন যুগিয়েছিলো। আজও বাংলাদেশে আসা রাজা, রাণী, রাষ্ট্রনায়ক, মেহমান গুণীজনকে অথবা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা জানানো বা উপহার সামগ্রী হিসেবে শীতলপাটির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

দিল্লির সিংহাসনে তখন সম্রাট আওরঙ্গজেব। সিলেট থেকে তাকে পাঠানো হলো উপঢৌকন এবং সেই উপঢৌকন ছিলো সিলেটের শীতলপাটি। পাঠিয়েছিলেন মুর্শিদকুলী খান। সিলেটের ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পের চাহিদা ছিল সব জায়গায়। বিশেষ করে মুঘল দরবারে খুব কদর ছিলো এই শীতল পাটির। মুসলিম শাসনামলে দিল্লির দরবারে সিলেট থেকে ৩১টি মহালের রাজস্বের (২৮৯৬৪ টাকা) পরিবর্তে এই শীতল পাটি রপ্তানি করা হতো। ভৌগোলিক আনুকূল্যই সিলেটে এ শিল্পের বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। একটি পরিসংখ্যানে জানা যায়, ১৯০২-১৯০৩ সালে সুরমা উপত্যকা (কাছাড় ও সিলেট সন্নিবিষ্ট ছিলো সুরমা উপত্যকায়) হতে প্রায় ১,৪০,০০০ মন পাটি রফতানী হয়েছিলো। ("বরাকের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সন্ধানে")

তাছাড়া, শীতল পাটির ঐতিহ্যের ভিত্তিতে ঝালকাঠি জেলা প্রশাসন জেলার ব্রান্ডিং নাম দিয়েছে "পেয়ারা আর শীতলপাটি এই নিয়ে ঝালকাঠি"। আমাদের জন্য এটি আনন্দ ও গর্বের বিষয় যে "ইউনেস্কো" ২০১৭ সালে শীতল পাটি-কে অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। শীতল পাটি যে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্য ইউনেস্কোর স্বীকৃতিই তার প্রমাণ।

(২) শীতল পাটির ব্যবহারকাল ঃ

প্রাচীন মুঘল আমল থেকেই বাংলাদেশে শীতল পাটি তৈরি হয়ে আসছে এবং শীতল পাটির ঐতিহাসিক দলিলই তার প্রমাণ।

(ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

(১) শীতল পাটি উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

গরমের সময় ঘুমানোর জন্য স্বস্তিদায়ক বলে গ্রামে শীতলপাটির কদর যুগ যুগ ধরে। ইদানীং শহুরে মানুষের ঘরেও শোভা পায় শীতলপাটি। শীতলপাটির বুননশিল্পীদের স্থানীয়ভাবে 'পাটিয়াল" বা 'পাটিকর' বলা হয়ে থাকে। পারিবারিক শিল্প হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়েই শীতল পাটি বুনন কাজের সঙ্গে যুক্ত। তবে, পুরুষ অপেক্ষা নারীরাই অধিকতর ভূমিকা রাখেন পাটি তৈরিতে। পুরুষরা মুর্তা গাছ কেটে তা থেকে বেতি তৈরি করা, রং দেওয়া এবং রোদে শুকানোর পর বুননের উপযোগী করে নারীদের হাতে সেটা তুলে দেন। নারীরা নানা নকশায়, নান্দনিকতায় ভরে তোলেন এর জমিন। শীতল পাটির রয়েছে হরেক রকম নাম। তবে নাম অনেক ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্থের উপরও নির্ভর করে। বেতের প্রস্থের মাপে শীতল পাটির নামকরণ করা হয়ে থাকে সিকি, আধুলি, টাকা, সোনামুড়ি, নয়নতারা, আসমানতারা প্রভৃতি।

পাটিকর মুর্তার কান্ড চিড়ে লম্বালম্বি কমপক্ষে চারটি ফালি করে যতটা সম্ভব সরু ও পাতলা বেতি তৈরি করে নেয়। বেতি সরু ও পাতলা হলে পাটি নরম ও মসৃণ হয়। বেতিগুলোকে মোলায়েম, মসৃণ ও চকচকে করার জন্য পানির সঙ্গে ভাতের মাড়, আমড়া, জারুল ও গেওয়া গাছের পাতা মিশিয়ে সিদ্ধ করা হয়। রঙিন নকশাদার পাটি তৈরির জন্য সিদ্ধ করার সময় ভাতের মাড়ের সঙ্গে রঙের গুঁড়া মেশানো হয়। পাটিকর মাটিতে বসে কাপড় বোনার মতোই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর বেতি স্থাপন করে নেয়। পাটি বোনার সময় বেতিগুলোকে ঘন আঁটসাঁট করে বসানো হয়, যাতে ফাঁক-ফোকর না থাকে।

অনেকেই বাজার থেকে পাটি পাতা কিনে এনে শীতল পাটি তৈরীর কাজ সম্পন্ন করেন এবং তাদের উৎপাদিত শীতল পাটি সম্পন্ন করা হয়-প্রথমে বাজার থেকে পাটি পাতা (মূর্তা) কিনতে হয়। বাঁশের কঞ্চির মতো দেখতে এ গাছ সাধারণত নদী, খাল, পুকুর পাড়ে বা পরিত্যক্ত জমিতে জন্ম নেয়। এক আটি পাতার দাম পড়ে ২৫০/৩০০ টাকা। বাড়িতে এনে কচিমুর্তা ৪ ফালি করে কাটতে হয়। এগুলোকে নীল বলে। এটি দিয়েই বোনা হয় শীতল পাটি। মুর্তার সাদা অংশও ফেলনা নয়। এটি দিয়েও তৈরি হয় পাটি। তবে সেটি শীতল পাটি নয়। নীল পাতলা করে কেটে গরম পানিতে সিদ্ধ করতে হয়। তারপর এটিতে রং লাগিয়ে কখনো বা রং ছাড়া শীতল পাটি বোনা হয়। এছাড়া পুরো পাটি তৈরির পর চারপাশে বাঁধাই দিতে হয় বেত দিয়ে যা জালি বেত নামে পরিচিত।

(২) শীতল পাটি তৈরীতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ঃ

শীতল পাটি সম্পূর্ণ হাতে তৈরী করা হয় বলে এটা তৈরীতে কোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু মুর্তা গাছ কাটার জন্য দা বা কাঁচি এবং বেতি বের করার জন্য বটি ব্যবহার করা হয়।

(৩) শীতল পাটির নির্মাণ কৌশল ও প্রক্রিয়া ঃ

পানির নির্মাণ কৌশলও চমৎকার। মুর্তা থেকে বেতি তৈরী করে গরম জলে সিদ্ধ করার পর রোদে শুকানো হয়ে থাকে এবং পাটি বুননের আগে জলে ভিজিয়ে তারপর বাইন দেওয়া হয়। সিদ্ধ করা বেতি সাধারণত শীতল পাটির জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বেতি আড়াআড়িভাবে বুনে পাটি তৈরী করা হয়। খাড়া ও আড়াআড়িভাবে বেতি সাজিয়ে বোনা হয় চিউনী বা বোটনী। ম্যাট বোনার মত করে দোধারায় বা তেধারা বনটে 'পাটি চিউনী' বোনা হয় বলে তাতে 'চোখ চেলা' ছাড়া অন্য কোনো নকশা করা যায় না।

পাটি তৈরির জন্য হাজার হাজার মুর্তার ছাল বের করা হয়। সেই একটি ছাল পাটি তৈরির জন্য প্রস্তুত করে তুলতে আলাদাভাবে সাতবার হাতে নিতে হয়। প্রথম দফায় মুর্তা থেকে চারভাগ করে বেত বের করা। এরপর সরু করতে হয়। তুলে ফেলতে হয় সম্পূর্ণ আঁশ। তারপর বেতি আকারে সমান করতে হয়। পুনরায় ছাল ফেলে রোদে শুকোতে দিতে হয়। এরপর বেতিগুলো আবার একঘন্টা পানিভর্তি টিনের পাত্রে ভিজিয়ে, গরম পানিতে সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ শেষে বেতিগুলো রোদে শুকিয়ে পুনরায় ঠান্ডা পরিষ্কার পানিতে ৫-১০ মিনিট ভিজিয়ে ধুয়ে তোলা হয়। এরপরই মুর্তা বেতি পাটি তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহাযোগ্য হয়। অনেক সময় পাটিতে নানা রং দিতে হয় কারুকাজের জন্য।

শীতল পাটির উপর যে মোটিফ ব্যবহার করা হয় বলাবাহুল্য তা সর্বত্র সমান হয় না। নামাজে ব্যবহৃত পাটিগুলি মুসলিম সমাজে ধর্ম ভাবনার সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত বলেই এগুলিতে চাঁদ, তারা, মসজিদের গম্বুজ প্রভৃতির মোটিফ অনিবার্যভাবে এসে যায়। এই ধরণের ধর্মীয় ধারণায় প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যাবেনা হিন্দু গৃহে ব্যবহৃত অধিকাংশ পাটিতে যদিও সেখানে অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে নানা রকম সুক্ষ্ম কারুকার্য ফুটে উঠে হিন্দু গৃহের পাটিগুলোতে। শীতল পাটি বোনার কৃতিত্ব দুই রকমে প্রকাশ পায়। অত্যন্ত মসৃণ পাটি বুনে তা গরমের দিনে বিছানার চাদরের মত করে ব্যবহার করা হয়। এই পাটি অত্যন্ত সরু ও মসৃণ বেতিতে বোনা হয়। এ ধরণের পাটি অত্যন্ত মূল্যবান। পাটি চিত্রিত করার মধ্যেও কৃতিত্ব আছে। তবে চিত্রিত পাটি তত মসৃণ হয় না। দোধারা ও তেধারা তথা দোয়াধারা ও তেয়াধারা বুনোটে জ্যামিতিক ছক ও সরলরেখার সাহায্যে চিত্র রূপের সৃষ্টি করা হয়। ইচ্ছামত এক বা একাধিক বেতি বুনোটের মাধ্যমে উপরে নিচে এনে চিত্রায়নে স্বাচ্ছন্দ আনয়ন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় শিল্পীর কল্পনা এখানে নেমে আসে দূর নভোলোক থেকে মর্তের মাটিতে, যাতে নকশী কাঁথার মত সজ্জিত হয় চিউনী বা বোটানী।

ছবিঃ মুর্তা বাগান

ছবিঃ মুর্তা গাছ

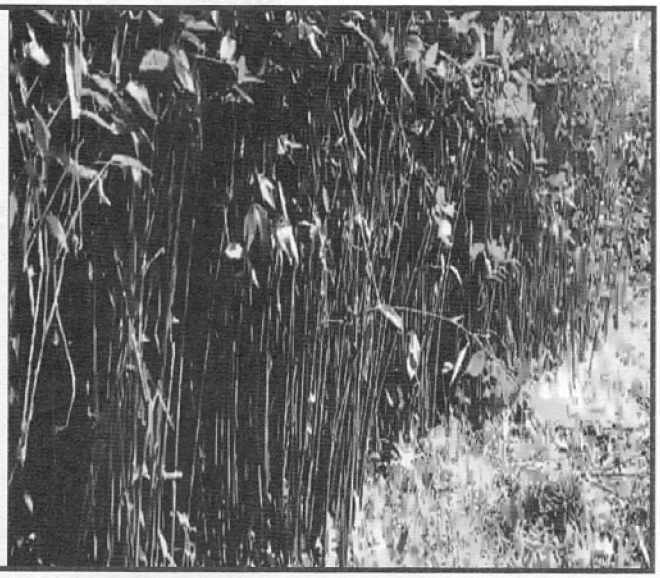

ছবিঃ মুর্তা বাগান

ছবিঃ মুর্তা বাগান

ছবিঃ মুর্তা বাগান থেকে মুর্তা কেটে সাইজ করা হচ্ছে

ছবিঃ মুর্তা বাগান থেকে মুর্তা কেটে নিয়ে আসা হচ্ছে।

ছবিঃ মুর্তা কেটে সাজিয়ে রাখা হয়েছে

ছবিঃ মুর্তা কেটে আটি বেধে রাখা হয়েছে

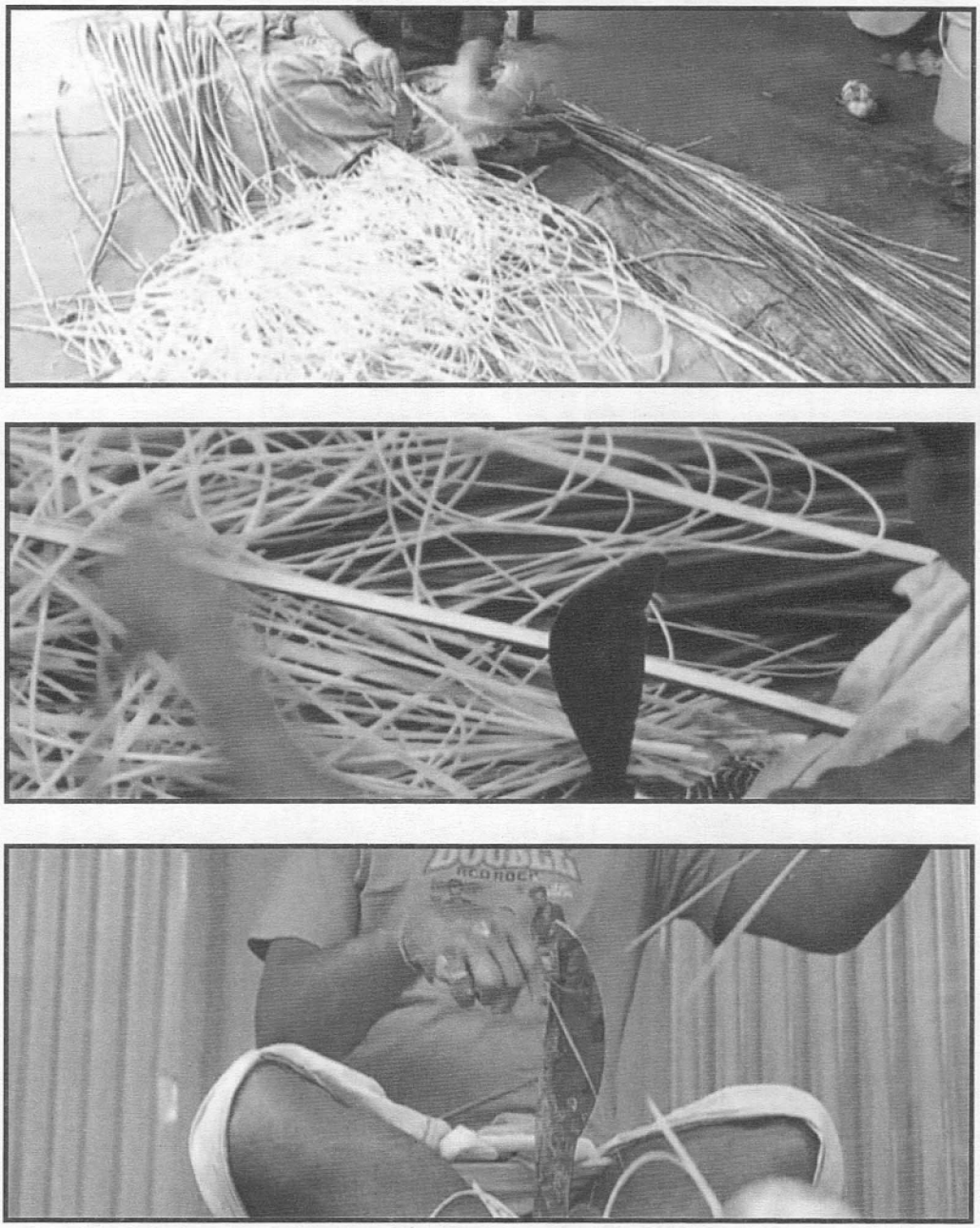

ছবিঃ মুর্তা গাছ থেকে বেতি বের করা হচ্ছে

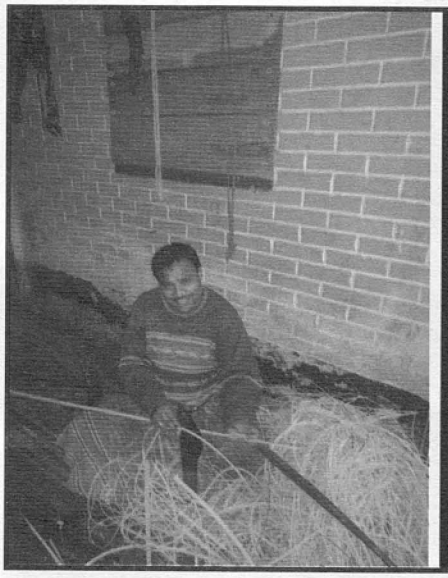

ছবিঃ মুর্তা থেকে বিভিন্ন ধরনের বেতি বের করা হচ্ছে

ছবিঃ মুর্তার বেতিকে পাতিলে ভাতের মাড়ের সাথে সিদ্ধ করা হচ্ছে

ছবিঃ রঙ্গিন পাটি তৈরির জন্য বেতিতে রঙ লাগোনো হচ্ছে

ছবিঃ মুর্তা বাগান থেকে মুর্তা কেটে সাইজ করা হচ্ছে

ছবিঃ পাতিল থেকে বেতি বের করে রাখা হয়েছে

ছবিঃ সিদ্ধ করার পর বেতি রোদে শুকানো হচ্ছে

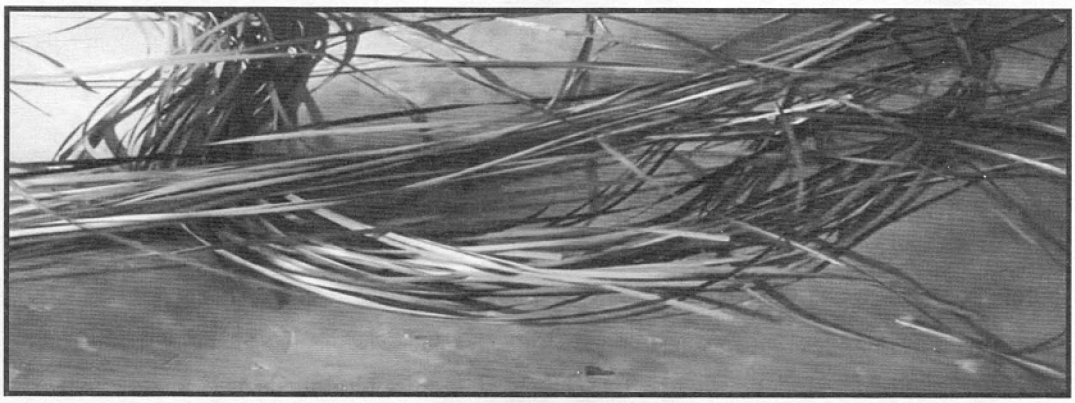

ছবিঃ সিদ্ধ করে রোদে শুকানোর পর বেতি

ছবিঃ বেতি দিয়ে পাটি বুনন করছেন

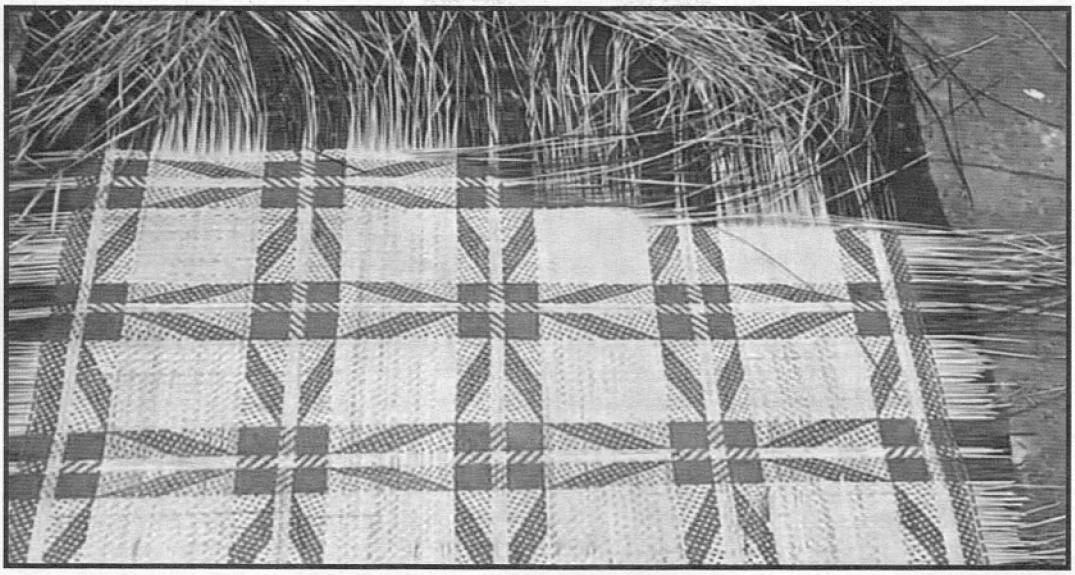

ছবিঃ রঙ্গিন পাটি বুনন

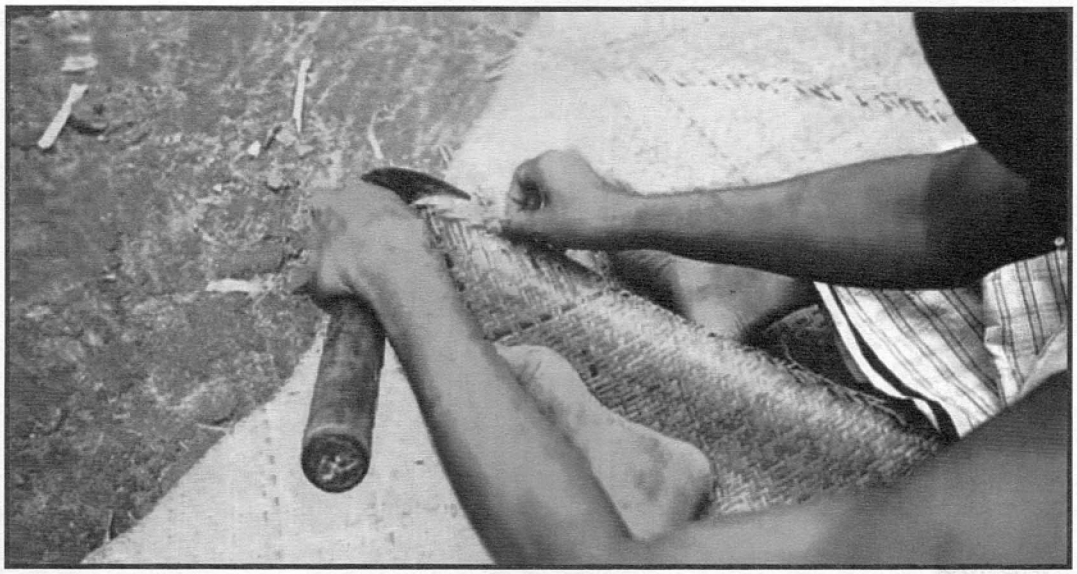

ছবিঃ পাটি বোনার পর ঘষামাজা করছেন

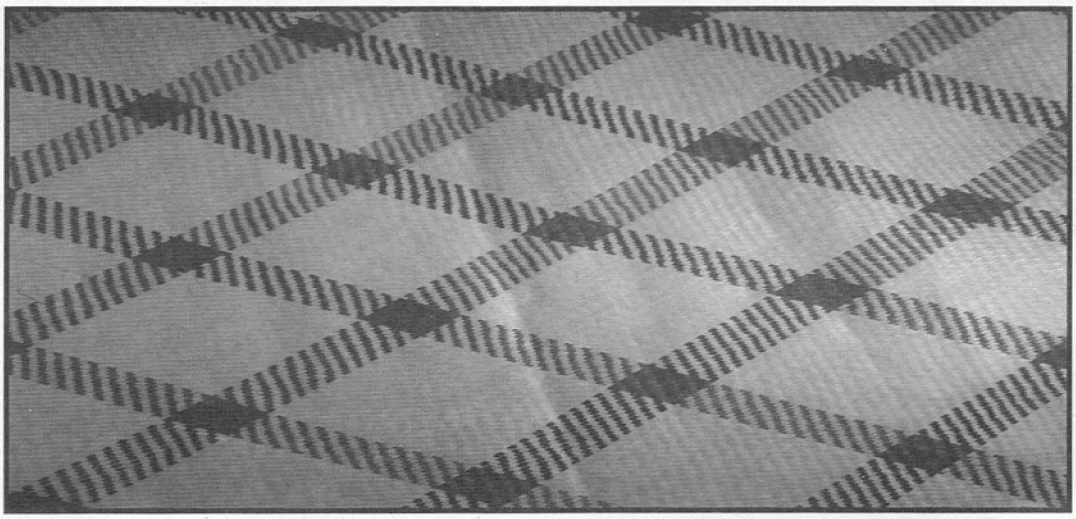

ছবিঃ সম্পূর্ণ একটি শীতল পার্টি

ছবিঃ মুর্তা দিয়ে তৈরী অন্যান্য সমগ্রী

(৪) শীতল পাটির ডিজাইন ঃ

শীতল পাটির সৌন্দর্যই হচ্ছে এর ডিজাইন বা নকশা। প্রাচীনকার থেকে বর্তমান পর্যন্ত নানা ধরণের বাহারি নকশা শীতল পাটি শিল্পকে সমৃদ্ধ করছে। এসব শীতলপাটি বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন সিকি, আধুলি, টাকা, নয়নতারা, আসমান তারা ইত্যাদি। গরম পানিতে মাড় দিয়ে যে শীতল পাটি তৈরি করা হয়, তা ১০ বছর যাওয়ার পরও কিছুই হবে না। আধূলির মসৃণতা কম হয় এবং এর বুননে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। একটি আধুলি তৈরিতে সময় লাগে তিন থেকে চার মাস। টাকা জোড়া দেওয়া শীতলপাটি দুই বা তার অধিক জোড়া থাকে টাকাতে। এগুলো অত্যন্ত মজবুত হয়। ২০ থেকে ২৫ বছরেও নতুন থাকে এই পাটিগুলো। এসব পাটির পাশাপাশি কিছু সাধারণ পাটি আছে, যা তৈরি করতে সময় লাগে এক থেকে দুই দিন। পাটির দাম নির্ভর করে সাধারণত মসৃণতা, বুননকৌশল ও নকশার ওপর।

শীতলপাটি শুধু যে একটি ব্যবহার্য সামগ্রী তা নয়। শিল্পীরা শীতলপাটির জমিনে নানা ধরনের নকশা ফুটিয়ে তোলেন গ্রামের নিরক্ষর মহিলারা, কিন্তু তাকে ধারণা দিলে তিনি পাটির জমিনে ফুটিয়ে তুলতে পারেন বাংলা আরবি, ইংরেজি বর্ণমালা। যে মহিলা কোনদিন তাজমহল দেখেননি, স্মৃতিসৌধ দেখেননি, তিনিই বেত দিয়ে ছবি আঁকেন সেই সব স্থাপনার। বাংলাদেশের মানচিত্র, পশুপাখি, নৌকা, মসজিদ, মন্দির ফুটিয়ে তোলেন পাটিতে। বিষয়টি স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন, শীতলপাটির জমিনে রং তুলি দিয়ে এসব ছবি আঁকা হয় না। নানা রঙ্গে বেতকে রাঙিয়ে বেত দিয়ে বুননের মাধ্যমে এসব দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়। শীতল পাটির আবেগ ঘন আরেকটি দিক হচ্ছে, একজন নারী দুই আড়াই মাসে একটি শীতল পাটি তেরী করেন। তিনি কোন ধরনের যন্ত্রের সাহায্য নেন না। দীর্ঘ সময়ে শীতলপাটি তৈরী করতে গিয়ে কতো আনন্দবেদনার স্মৃতি রোমন্থন করেন শিল্পীরা। বেদনার স্মৃতিতে কতো ফোটা চোখের জল ঝরেছে শীতল পাটির বুকে, কে রেখেছে তার হিসেব।

বিভিন্ন ডিজাইনের শীতল পাটি

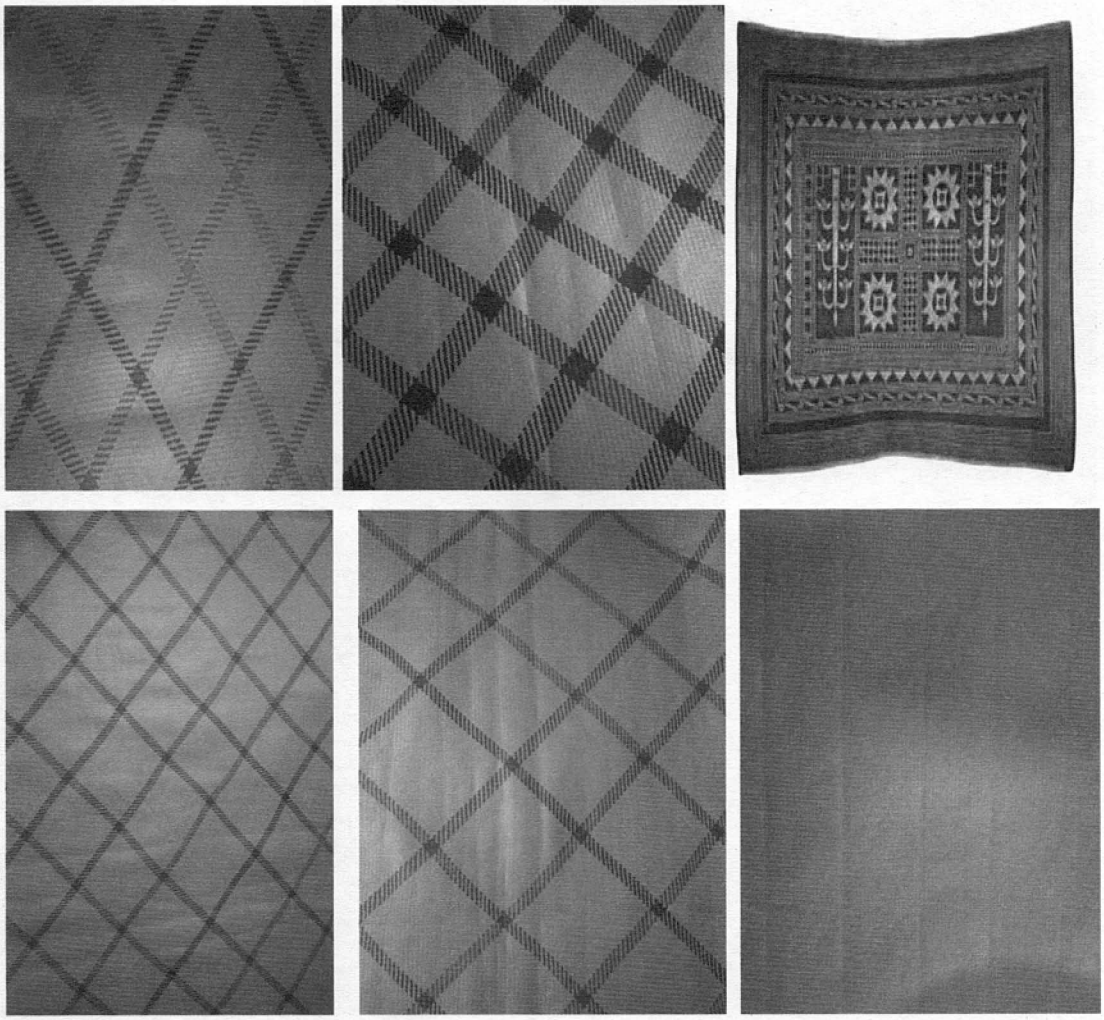

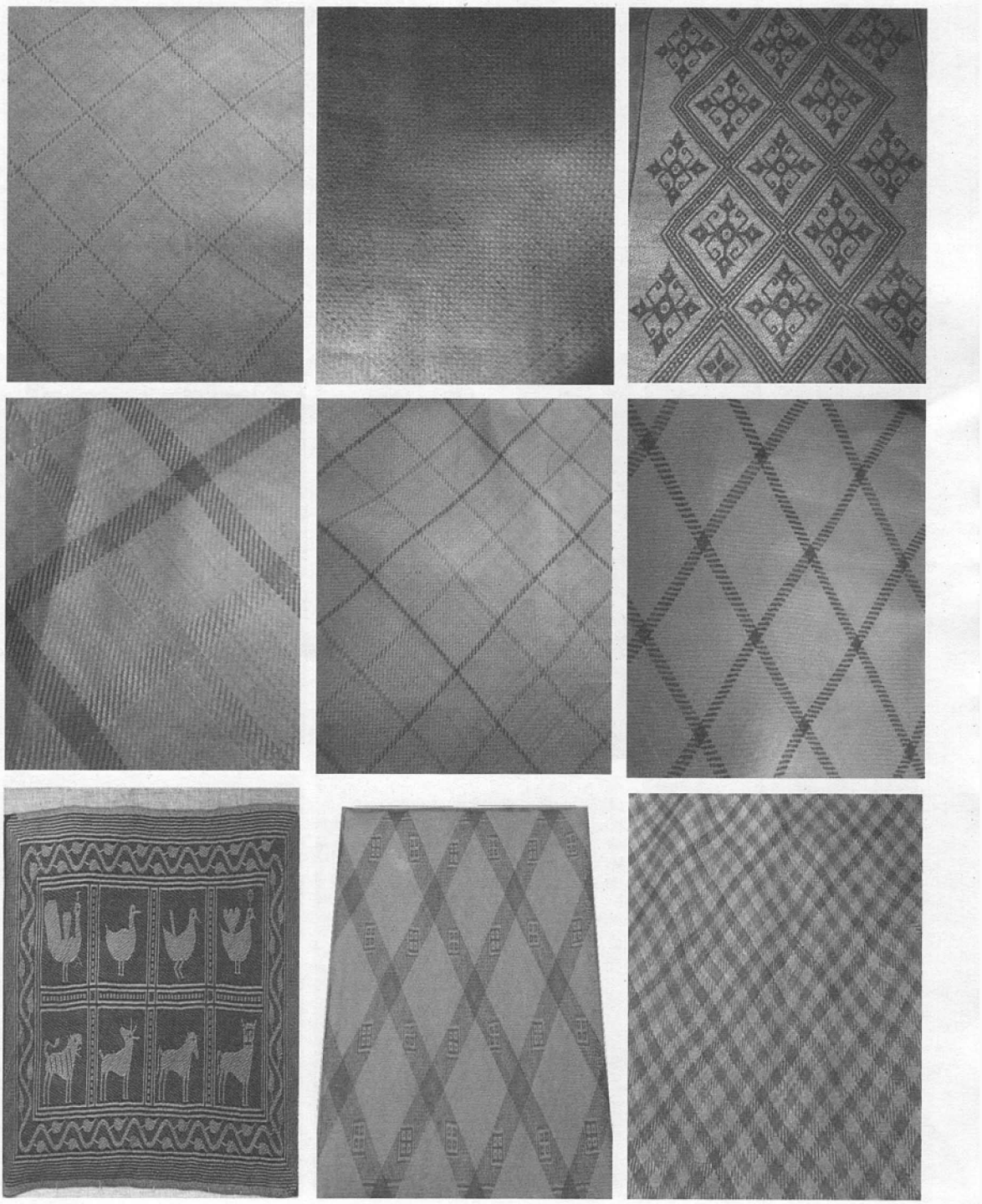

(ঞ) শীতল পাটির অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

শীতল পাটির দুর্লভ নকশা অবাক হয়ে দেখার মত। শীতল পাটির অনন্য বৈশিষ্টের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এর শীতলতা এবং মসৃণতা। এই পাটি এতই মসৃণ হয় যে, এই পাটির উপর দিয়ে সাপ চলাচল করতে পারে না। তাছাড়া, শীতল পাটির মনভুলানো কারুকার্যে প্রাচীন কাল থেকেই এটা ব্যবহার হয়ে আসছে। অতি উদার ও সরল কারিগরি ডিজাইন নকশিপাটির শিল্পীদের সুস্থ মনের একটি পরিচায়ক। মঙ্গলাচরণ, অন্নপ্রাশন, বৌভাত, শবে-বরাত, হিন্দুদের শব যাত্রা, ঈদ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে ঘরে ঘরে শীতল পাটির ব্যবহার লক্ষণীয়। মুসলমান সমাজে নামাজ আদায় করতেও "জায়নামাজ" হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে বিভিন্ন রকমের মন মাতানো পাটি।

(ট) শীতল পাটি পণ্যের শ্রেণি ঃ

শীতলপাটির রয়েছে নানা নাম আর জাত। এর মধ্যে 'পয়সা', 'সিকি', 'আধুলি', 'টাকা', 'নয়নতারা', 'আসমান তারা', 'শাপলা', সোনামুড়ি', 'টিক্কা' নামের পাটির ব্যবহার গ্রামের গৃহস্থ পরিবারে বেশি। এ ছাড়া অভিজাত পাটি হিসেবে 'লালগালিচা', 'ধাধুলি', 'মিহি' চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করা হয়। আবার শীতল পাটির নকশার ধরনের উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু শ্রেণীবিন্যাস করা হয়ে থাকে। যেমন–তাজমহল, গাছপদ্ম, নামাজি পাটি, আদি, কমলকুশ ইত্যাদি। এসবের বাইরে দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী নানা ধরনের পাটি রয়েছে। বুননের মাধ্যমে পাটিতে পৌরাণিক কাহিনিচিত্র, পাখি, ফুল-লতা-পাতা বা অন্যান্য জ্যামিতিক নকশা ও মোটিফ তুলে ধরা হয়। পাটিগুলো সচরাচর ৭ × ৫ ফুট হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রচলিত পাটির মধ্যে শীতল পাটি, তালাই পাটি, চাটাই পাটি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রকার পাটিকে বুনন অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা হয়–(১) সেদ্ধপাটি ও (২) সাধারণ পাটি। উভয় প্রকার পাটির আবার প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন–মোটা বেতের পাটি ও সরু (চিকন) বেতের পাটি। অঞ্চলভেদে এগুলিরও বিভিন্নতা হয়ে থাকে। যেমন-'লাগজোড়া' বা জোড়াবাইন ও 'ছিটাজোড়া' বা ছিটাবাইন। বুনন ছাড়াও পাটি অলঙ্করণের মধ্যে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য।

(ঠ) অন্যান্য ঃ

শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টির অকারণ পুলকের জন্যই নয়, নানা সামাজিক প্রয়োজনে পরম্পরাগতভাবে শীতল পাটির ব্যবহার হয়ে থাকে। ব্যবহারিক আধারকে ভিত্তি করেই পাটি শিল্পীরা সৌন্দর্যকে বিকশিত করায় প্রয়াস নেন। এটার নান্দনিক মূল্য অপেক্ষা ব্যবহারিক মূল্য অনেক বেশী। এছাড়া এই শিল্পকর্মের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল নারীদের অবদান। মহিলারা পুরুষের সহযোগী হিসাবে সহায়তা করে থাকেন। বর্তমানে বেশির ভাগ হস্তজাত শিল্পের অস্তিত্ব হারিয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান চাহিদা নিয়ে যে হস্তশিল্পটি সগৌরবে টিকে আছে সেটা হচ্ছে শীতল পাটি। একথা ঠিক শীতল পাটির মত আরামদায়ক কোনও শয়ন সামগ্রী আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন কলকারখানার পক্ষে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি বলে বাংলাদেশের শীতল পাটি আজও বিখ্যাত। দেশের সবকটি গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে সারা বছর এই পাটির চাহিদা রয়েছে।

(ড) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ঃ পণ্য বৈচিত্রকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখা, বিপণন বিভাগ, বিসিক, ঢাকা।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.
2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.
3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.
4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.
5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.
6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.
7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.
8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.
9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.
10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.
11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: Dr. Mohammad Mofizur Rahman,Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Hasina Begum, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.